বাংলাদেশে একুশের মর্মবাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে

কালের আয়নায়

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। মহান ভাষাশহীদ দিবস। আজকাল তার সঙ্গে একটি নতুন কথাও যোগ হয়েছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশের এই খেতাব বৃদ্ধিতে বাংলাভাষার বা বিশ্বের উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাগুলোর কতটা উন্নতি ঘটেছে, তা জানি না। কিন্তু বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে একুশের ব্যাপ্তি, পরিধি এবং আড়ম্বর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একুশের বয়স এখন সাতান্ন বছর। এই সাতান্ন বছর ধরেই একুশের ওপর লিখছি। প্রথম দশ-পনের বছর লিখতে একটা আবেগ ও অনুপ্রেরণা পেতাম। মনে হতো একটা বড় আদর্শ– নিজের ভাষা-সংস্কৃতির জন্য লিখছি। লেখাটাই আমার লড়াই। এখন এই আবেগ ও প্রেরণাটা তেমন নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফরমায়েশি লেখা লিখি। সম্পাদকরা চান তাই লিখতে হয়। আগের মতো এই লেখার তাগিদ অনুভব করি না। একুশে এখন দেশ-বিদেশের বাঙালির সামাজিক জীবনের একটি বড় বার্ষিক আনুষ্ঠানিকতা। আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে আর কত আপ্তবাক্য লেখা যায়?

তবু লিখছি। বায়ান্নর একুশের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। জেল খেটেছি, গান লিখেছি। সুতরাং একুশে নিয়ে যেসব মিডিয়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থা অনুষ্ঠান করে, তারা আমাকে ছাড়বে কেন? নবী দিবস, মিলাদের মৌসুম, ছেলের খতনা, মৃত পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য কোরআনখানি, কুলখানির সময় যেমন একশ্রেণীর পেশাদার মৌলবির চাহিদা বেড়ে যায়, একদিনে দশটা জেয়াফত তাদের কবুল করতে হয়, তেমনি বাংলাদেশে (এখন বহির্বিশ্বেও) একুশে এলে বাংলাভাষার পণ্ডিতদেরও লেখার চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে যায়– এমনকি আমার মতো অপণ্ডিতেরও। যেখানেই যাই, চোখের সামনে একটি মোবাইল টিভি ক্যামেরা এবং মুখের সামনে একটি স্পিকার উদ্যত হয়। তারপরই অনুরোধ, একুশে সম্পর্কে কিছু বলুন অথবা পত্রিকার সম্পাদকের জোর তাগাদা, এটা একুশের মাস। একুশ সম্পর্কেই কিছু লিখুন।

কী লিখব, কী বলব তা ভাবতে হয় না। পঞ্চাশ বছর ধরে যা লিখছি, যা বলছি তা একটু হেরফের করে আউড়ে গেলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। একুশে যে আমাদের বড় গৌরবের দিন, ফেব্রুয়ারি যে আমাদের বড় গৌরবের মাস, বাংলাভাষা আমাদের কত আপন এবং তার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আমরা যে এখনো ঘটাতে পারিনি, তার জন্য কিছু পণ্ডিতি-কান্না; ব্যস, ঢাউস একখানা নিবন্ধ দাঁড়িয়ে গেল। আজকাল তো আবার টেলিভিশনে টক শো হয়েছে। তাতে আপ্তবাক্যগুলো আরো ভালোভাবে ক্যামেরার সামনে বসে আওড়ানো যায়। তাতে একুশের জেল্লা আরো বাড়ে।

বিদেশে বাস করি। লন্ডনের মতো শহরে। তাও এবার গুণে দেখলাম, একুশের ওপর টিভি সাক্ষাৎকার পাঁচটি, রেডিওতে বক্তব্য প্রদান সাতটি, যাব না যাব না করেও একুশের আগেই তিনটি অনুষ্ঠানে যোগদান, লন্ডনসহ আশপাশের এবং ইউরোপের কয়েকটি শহরে একুশের অনুষ্ঠানে এবার যোগদানে অক্ষমতা জানানো ইত্যাদি হয়ে গেছে। তবু বিদেশে একুশে উদ্‌যাপন করাই আমি এখন পছন্দ করি। বিদেশে একুশের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে তার সেক্যুলার চরিত্রটি এখনো অক্ষুণ্ন আছে। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি বড় পর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলোতেও এই সেক্যুলার চরিত্র আর অক্ষুণ্ন নেই। পাকিস্তান আমলেও যে বাংলাদেশে (তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তান) একুশের অনুষ্ঠান কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা শুরু হতো না, এখন সেখানে কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা শুরু করা হয়।

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় গিয়েছিলাম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক, কেজি মুস্তাফা এবং আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ নানা ধর্মের ছাত্রছাত্রী। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখি অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা এবং শেষ করা হলো শহীদদের জন্য মোনাজাতের দ্বারা। ভাগ্য ভালো, আমাদের ভাষাশহীদদের মধ্যে কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ নাম ছিল না, থাকলে তাদের জন্য কী করা হতো আমি জানি না।

অধিকাংশ একুশের অনুষ্ঠান এখন করা হচ্ছে অনেকটাই ধর্মীয় প্রথামতো। দীর্ঘকাল পর দেশে ফিরে আমার জন্য এটা ছিল একটি শকিং এক্সপেরিয়েন্স। আমি দেশে থাকাকালে একুশে সত্যই ছিল সর্ববাঙালির একটি সেক্যুলার অনুষ্ঠান। আমি দু'দশকের মতো দেশে অনুপস্থিত ছিলাম। সেই সময়ে স্বাধীন ও সেক্যুলার বাংলাদেশে মহান একুশে তার ধর্মনিরপেক্ষতা ও সর্বজনীনতার চরিত্র হারিয়েছে তা জানতাম না।

ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের কোনো মুসলমান নাগরিক বা কোনো ধর্মীয় সংস্থা সম্প্রদায়গতভাবে একুশে উদযাপন করতে গিয়ে অবশ্যই কোরআন পাঠ, মোনাজাত ইত্যাদি করতে পারেন; কিন্তু যেখানে অনুষ্ঠানটি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্ববাঙালির এবং এই দিনটির সৃষ্টিও একটি অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তা পুনর্নির্মাণের তাগিদে এবং গোটা পাকিস্তান আমলেও (দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে) একুশে উদযাপিত হয়েছে সর্ববাঙালির একটি সেক্যুলার অনুষ্ঠান হিসেবে, সেখানে স্বাধীন ও সেক্যুলার দেশ-পরিচয়ের দাবিদার বাংলাদেশে সেই দিবসটিকে কারা কোন উদ্দেশ্যে ধর্মের খোলস পরিয়ে দিলেন? একাত্তরের মার্চ মাসে বর্বর পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করার পর তাদের কোলাবরেটর জামায়াতিরা (ধর্ম যাদের কাছে রাজনৈতিক ব্যবসা) ঢাকায় অমর ভাষাশহীদদের স্মৃতির মিনার ভেঙে মসজিদ তৈরি করতে নেমেছিল। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি বলা হয়। কিন্তু শহীদ মিনারকে মসজিদ করা না গেলেও শহীদ দিবসকে ধর্মের আলখাল্লা পরানো সম্ভব হয়েছে।

আমি বছর দুই আগে ঢাকার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা যখন ভাষা দিবসের মতো সর্ববাঙালির জাতীয় দিবসটিকে কোরআন পাঠ দ্বারা উদযাপন করা শুরু করেছ, তখন বাঙালির আরেকটি বড় সেক্যুলার উৎসব বৈশাখী বা নববর্ষ উৎসব শুরুও কি কোরআন পাঠ দ্বারা শুরু করবে? বন্ধু হেসে বলেছেন, বাংলাদেশ এখন আধা-তালেবানি রাষ্ট্র। পুরো তালেবানি রাষ্ট্র যদি হয়, তাহলে বাংলা নববর্ষ উৎসব হয় উঠে যাবে, নয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ দ্বারা শুরু হবে।

বন্ধুকে বলেছি, ইরান এখন পুরোপুরি মুসলিম দেশ। রাষ্ট্রটিও ইসলামী প্রজাতন্ত্র। এককালে ইরানিরা ছিল অগ্নিপূজক। তখন থেকে তাদের নববর্ষ উৎসব পালন শুরু। নাম নওরোজ উৎসব। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও– এমনকি খোমেনিদের ইরানেও নওরোজ উৎসব আগের রীতিনীতিতেই সাড়ম্বরে পালিত হয়। কোরআন পাঠ দ্বারা নওরোজ উৎসব শুরু হয় না।

আলজেরিয়া ও তুরস্ক দুটিই মুসলিম দেশ। কিন্তু তারা নিজেদের সেক্যুলার রাষ্ট্র বলে দাবি করেন। আমি আলজেরিয়ায় গেছি। তাদের পার্লামেন্ট অধিবেশন দেখারও সুযোগ হয়েছে। কিন্তু আলজেরিয়া বা তুরস্ক কোনো দেশেই নতুন পার্লামেন্টের অধিবেশন কোরআন পাঠ দ্বারা শুরু করা হয় না। কোরআন এ দুই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। তারা একে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, অধ্যয়ন করেন। কিন্তু রাজনীতিতে বা জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেন না। বাংলাদেশ একটি সেক্যুলার দেশ বলে দাবি করে এবং তার ভাষা-সংস্কৃতিও সেক্যুলার। কিন্তু এদেশে নতুন পার্লামেন্ট অধিবেশনও শুরু হয় কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা। এবার নিরঙ্কুশ আওয়ামী সংখ্যাগরিষ্ঠ নবম পার্লামেন্টের অধিবেশনেও তাই করা হয়েছে।

বহু ধর্মমত ও ধর্মসংস্কৃতির দেশে (যেমন বাংলাদেশ) যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম-সংস্কৃতিকেই জাতীয় সংস্কৃতি বলে সবার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই দেশ সেক্যুলার বলে দাবি করে কী করে? বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে। একুশের সেক্যুলার চেতনা তার রাষ্ট্রাদর্শের মূল ভিত্তি। সেই দেশের সংবিধানে ক্ষমতা অপহরণকারী সামরিক শাসকরা বন্দুকের জোরে রাষ্ট্রধর্মের বিধান ঢুকিয়ে তার স্বাধীনতার মূল ভিত্তি ধ্বংস করেছে। এখন দেশটি না সেক্যুলার, না ধর্মীয় রাষ্ট্র। এ যেন হুইস্কির বোতলে আবেজমজমের পানি। গোটা জাতি দ্বিচারিতায় ভুগছে। ভুগছে একুশের ভাষা দিবসটিও। চরিত্রভ্রষ্ট জাতি বা দেশ কখনো আত্মপরিচয় আবিষ্কার করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

আমার এই আলোচনাটি মহান ভাষা দিবসকে নিয়ে। তাই ভাষার কথাতেই ফিরে যাই। আজ যে বাংলাদেশে বাংলাভাষার শহীদদের দিবসটিকে ধর্মের খোলস পরানো সম্ভ ব হয়েছে এটা স্বাধীন হওয়ার পরও আমাদের অবচেতন মনে পাকিস্তানি মানসিকতার ভূত চেপে থাকার ফল। পাকিস্তানি শাসকরা চেয়েছিল, বাংলাভাষার হাজার বছরের সেক্যুলার চরিত্র ধ্বংস করে তাকে তথাকথিত ইসলামী জবানে পরিণত করে উর্দু বা ফারসি ভাষার আশ্রিত উপভাষার পর্যায়ে নামিয়ে এনে কালত্র মে তাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া। আমরা বলে থাকি, ভাষাপ্রেম ও স্বাধিকার চেতনা থেকে আমরা পাকিস্তানি শাসকদের এই চত্র ান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমার ধারণা, মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক প্রাণের টানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের গড়ে ওঠা শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের একটা বড় আশঙ্কাও তাদের এই আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছিল। এই আশঙ্কাটা ছিল, উর্দু যদি পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী (শতকরা ৫৬ ভাগ) হয়েও তারা ভাষা-বৈষম্যের কারণে দেশটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে এবং সরকারি চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র তারা অবাঙালি পাকিস্তানিদের সঙ্গে সমানাধিকার (বয়ঁধষ ড়ঢ়ঢ়ড়ৎঃঁহরঃু) না পেয়ে প্রতিযোগিতায় হারতে থাকবে এবং তাদের কলোনির বাসিন্দার অবস্থানে নেমে যাবে। এজন্যই দেখা যায়, বায়ান্নর বাংলাভাষার আন্দোলনটি জনগণের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু না হয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভ্যানগার্ড ছাত্রসমাজের দ্বারা শুরু হয়েছিল।

বাংলাভাষা পাকিস্তান আমলেই অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি লাভ করে এবং ভীতিমুক্ত বাঙালিদের মনেও ভাষা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য (রাষ্ট্রীয় কাজে ভাষার ব্যবহার, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভাষার ব্যবহার, ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষা হিসেবে তার উন্নয়ন) ধীরে ধীরে অর্ধবিস্মৃত হয়ে কেবল বার্ষিক দিবস পালনটিই বড় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, উন্নত হয়নি এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহৃত ভাষা হয়েও ওঠেনি। আমরা বিদেশি ভাষাকে বর্জনের আন্দোলন করেছি, কিন্তু দেশি ভাষাকে উন্নয়নের তেমন উদ্যোগ নেইনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ ঘটনাটাই ঘটেছে। আমরা ইংরেজি বর্জন করেছি, কিন্তু বাংলাভাষাকে একটি স্বাধীন দেশের কার্যনির্বাহী ভাষা হিসেবে উন্নত করে তোলার ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। ফলে ইংরেজি বর্জন দ্বারা আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা আবার এমনভাবে ইংরেজির দিকে ফিরে গেছি যে, তাতে বাংলাভাষার দিকে উপেক্ষা পরাধীনতার আমলের চেয়েও বেড়েছে। ইংরেজির দিকে মুখ ফিরিয়ে আমরা আবশ্যিক সুফল পাব। কিন্তু বাংলাকে উপেক্ষা দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হবো। আমাদের দরকার ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের রাজনীতি গ্রহণ করা।

আমি এই বিশ্বায়নের যুগে, বিশেষ করে এই নবপ্রযুক্তির তথ্যপ্রবাহের যুগে (ওহভড়ৎসধঃরড়হ ধমব) ইংরেজি বর্জনের ঘোর বিরোধী। ইংরেজি এখন বিশ্বভাষায় পরিণত হয়েছে। এমন যে জাপান ও চীন এককালে ইংরেজি ভাষার সাহায্য ছাড়াই এতটা উন্নত হয়েছে, তারাও বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক ও কারিগরি উন্নতিতে ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলোকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেদের দেশের ইংরেজিকে অবশ্য পাঠ্য ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে, তারা ইংরেজি বর্জন না করে নিজেদের ভাষাকে ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষা হিসেবে এতটাই উন্নত করে তুলছে যে, একসময় হয়তো তারা আর ইংরেজির প্রয়োজন বোধ করবে না।

অন্যদিকে আমরা এক সময় বাংলাভাষার নামে হুজুগে প্রবণতায় মেতে ইংরেজি বর্জন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং এখন সেই ক্ষতিপূরণের নামে আবার ইংরেজির দিকে এমন অন্ধ আবেগে ধাবিত হয়েছি যে, তাতে বাংলার উন্নয়ন ও বিকাশের কাজ অনেকটাই উপেক্ষিত হচ্ছে এবং তার মাশুল একদিন গোটা জাতিকেই দিতে হবে। ইংরেজি শেখা ও ব্যবহার এবং বাংলাকে রাষ্ট্রের সব কাজে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণে আমরা কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করতে পারিনি। বাংলাভাষার এখন বিশ্বময় ব্যাপক প্রসার। কারণ বাঙালি এখন সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রসারতা ভাষার ব্যবহারিক ভিত্তি পোক্ত করেনি। অন্যদিকে একুশে এখন আন্তর্জাতিক দিবস হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু তার আসল মর্মবাণী উপেক্ষিত। আদর্শ ও লক্ষ্যের বদলে একুশ এখন একটি বড় আনুষ্ঠানিকতা। বাংলাদেশে এখন বাংলা রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্যের সরকারি ভাষা। কিন্তু দুই বাংলাতেই বাংলাভাষার অবস্থা খুব ঈর্ষা করার মতো। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষায় ঢুকছে এন্তার অপ্রয়োজনীয় হিন্দি শব্দ। হিন্দির অনুকরণে, হিন্দি শব্দ মিশ্রিত বাংলা বলার রেওয়াজ পশ্চিমবঙ্গে এক খিচুড়ি ভাষার জন্ম দিতে যাচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে ইংরেজি অনুকরণে, ইংরেজি টানে, ইংরেজি শব্দ মিশ্রিত বাংলা বলার প্রবণতা এক অপভাষার নাকি আবির্ভাব ঘটিয়েছে, যার নাম বাংরেজি। রবীন্দ্রনাথ একবার এক ভদ্রলোকের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'তিনি ইংরেজি শুদ্ধভাবে শেখেননি, আবার বাংলাটাও ভালো জানেন না।'

বর্তমান বাংলাদেশের একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালির মুখের বুলি শুনলে রবীন্দ্রনাথ তাদের সম্পর্কে কী লিখতেন তা এখন অনুমান করতে পারি।

আমার একটি ধারণা, বাংলাদেশে সেক্যুলার রাজনৈতিক বিপ্লব যে সফল হয়েও হতে পারছে না, তার কারণ আমাদের সেক্যুলার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিত্তিটাও খুব পোক্ত নয়। আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের উৎস একুশকেও তো এখনো ধর্মীয় কালচারের শিকলে বন্দি করার চেষ্টা চলছে। এই বন্দি একুশের আসল মর্মবাণী নীরবে-নিভৃতে কেঁদে বেড়াচ্ছে। এই একুশকে মুক্ত করার জন্যই বাংলাদেশে আরেকটি একুশের প্রয়োজন। প্রয়োজন আমাদের অর্ধসমাপ্ত সেক্যুলার সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়া। নইলে সেক্যুলার রাজনৈতিক বিপ্লবও সফল হতে পারবে না। বারবার বিপর্যস্ত হবে। আওয়ামী লীগের নির্বাচন বিজয়ও তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি, শুত্র বার, ২০০৯